অষ্টাদশ শতকের - শিবনিবাস - কৃষ্ণচন্দ্র রায়

মায়া সাহা বিশ্বাস

অষ্টাদশ শতকে নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় 'শিবনিবাস' নামাঙ্কিত করে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলা সাহিত্যের কালজয়ী 'প্রতীকপুরুষ' — রায়গুণাকার ভারতচন্দ্র রায় ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। আলিবর্দ্দী খাঁ কর্তক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগারে নিক্ষেপ, 'অন্নপূর্ণার অনুগ্রহে মুক্তিলাভ এবং তৎসহ সমসাময়িক কিছু ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন এবং তার অনুগ্রহ ও বৈষয়িক উন্নতি লাভই ছিল তার এই কাব্য রচনার বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত হতাশার সঙ্গে জানাই, ''সেই রাজাও নেই, তার রাজত্বও নেই।'' ইতিহাসখ্যাত শিবনিবাসের জৌলুষও নেই। সে আজ উদাসী, প্রৌঢ় এবং বিষণ্ণ। নেই ধনৈশ্বর্য, সুদূরব্যাপ্ত এক বৈরাগ্যের বিষণ্ণতা, ধুমলা কুয়াশা, প্রাচুর্যময়ী রাজপ্রসাদের বাহার নেই, নেই রূপসজ্জার প্রাচুর্য। 'ত্রিজগতীনাথ শিবলিঙ্গ' আজ প্রৌঢ়ত্বের পরে জড়তাগ্রস্থ ধূসর বার্ধক্যে রূপান্তরিত হয়েছে। বর্ণবৈভবহীন রুপমূর্তির মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে এক মহামৌণী তপস্যাব তপশ্চর্যা। অনন্ত বৈরাগ্যের ধূসর অঙ্গীকার। বিবর্ণ কাননবীথি পাতায় পাতায় নিঃশেষে ঝরে যাবার নির্মম ডাক। শুধুমাত্র আলোকছায়ার বিচিত্র খেলা। বনফুলের সগন্ধি ভরা প্রাণ উচাটনকরা বাতাস। এ যেন এক অপরূপ 'বিজনভূমি' —এমান চিরস্থিত গ্রাম শিবনিবাস।

নদীয়াজেলার বাংলাদেশে সীমান্তের নিকটবর্তী, কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত ও মাঝদিয়া স্টেশনের সন্নিকটে বহুপুরাতন এক প্রত্যন্ত গ্রাম। যদিও এই প্রত্যান্তগ্রামেই জন্মেছেন কবি-সাহিত্যিক- শিক্ষাবিদ-প্রাবন্ধিক-সাধক- রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী প্রমুখ। মাঝদিয়া থেকে কৃষ্ণনগরমুখী বাসরাস্তার বাঁদিকে খেয়া পার হয়ে (যদিও এখন সাকো দিয়ে যাতায়াত করা যায়) ইতিহাসখ্যাত ও পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ 'শিবনিবাস' গ্রাম। 'শিবনিবাস' অর্থাৎ শিবেব আলয়। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজত্বকাল ১৭২৮-১৭৮২ খ্রিষ্টাব্দ। ওই আমলে 'নসরত খাঁ' নামে এক দুর্ধর্ষ ডাকাত ছিল। তাঁর দলবল নিয়ে সে গভীর অরণ্যে বসবাস করত। তখন ওই জায়গাটির নাম 'নসবতখার বেড়' নামেই সবাই জানত। শোনা যায়, সন্ধ্যার পরে তো দূরের কথা দিনেরবেলাও কোনো জনমানুষ্য ওই 'বেড়'—এর সামনে দিয়ে যেতে সাহস পেত না। ডাকাতদের অত্যাচারে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। সর্বদাই ভয়-ভীতি, আতঙ্কে শিটিয়ে থাকত। প্রজাশুভাকাঙ্ক্ষী নদী রাজের নিকট এই বার্তা পৌঁছানো মাত্র সৈন্য-সামন্ত নিয়ে শিবির স্থাপন করেন। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টায় ডাকাত দমন করে প্রজাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলেন। প্রজাগন সুখে-শান্তিতে বসবাস করেন।

জনশ্রুতি—একদিন সকালে মহারাজ আত্মীয় -পরিজনসহ চূর্ণি নদীর ঘাটে হাত-মুখ ধুতে গিয়ে দেখতে পান একটি ঢাউস রুইমাছ রাজার সম্মুখে আসছে। তখন একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয় উৎফুল্লে বলে ওঠেন, ''মহারাজ, দেখুন— এই স্থান আপনার বাসের উপযুক্ত স্থান। অদূরেই রাজভোগ্য রাজসিক আহার আপনা হতেই আপনার সম্মুকে উপস্থিত হয়েছে।'' শুনে রাজা মহোল্লাসে বললেন, ''কই দেখি...দেখি, বা: রুইমাছটি আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। তোমার প্রস্তাব অতি উত্তম। আমিও দীর্ঘদিন ধরে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করছি।''

নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে মারাঠা-বর্গীদের আক্রমণের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য নিরাপদ আশ্রয় সন্ধান করছিলেন। ওই সময়ের দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্রের নেতৃত্বে চূর্ণি নদীর দ্বারা কঙ্কনের আকারে পরিবেষ্টিত এই স্থানে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বিশাল রাজপ্রাসাদ নির্মান করেন। মনোরম রাজসৌধ, হস্তী, অশ্বশালা, সৈন্যবাস, পুষ্পোদ্যান ও নানাবিধ প্রকারে সুসজ্জিত করেন। সেইসঙ্গে ১০৮টা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিবের নিবাস—শিবনিবাস, শিবের আলয়— শিবালয়। এই নামে নতুন রাজধানী হল। জায়গাটি হল 'শিবনিবাস নামে। সেই নাম আজও পরিচিত।

ওই সময়ে সভাকবি ছিলেন রায়গুনাকর ভারতচন্দ্র রায়। ফরাসডাঙার দেওয়ান ইন্দ্রনাথ চৌধুরীর সাহায্যে চল্লিশ টাকা বেতনে মহারাজকৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি পদে বৃত হন। কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতায় সেখানে তিনি রচনা করেন 'রসমঞ্জরী' নামে একখানি কাব্যতত্ত্বগ্রস্ত এবং তাঁর বহুবিশ্রুত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য। মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত 'মূলাজোড়' গ্রামে শান্তিতেই দিনযাপন করছিলেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর, পরিহাস স্থানীয় জমিদারের এক কর্মচারী তাঁকে বাস্তুত্যাগে বাধ্য করতে চক্রান্ত করে। সে যাইহোক, সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। সেখানেই মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ইহলোকের মায়া কাটিয়ে পরলোকে গমন করেন। এই অকাল মৃত্যুতে মহাবাজ সাময়িক ভেঙে পড়েন। কারণ সভাকবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও প্রিয় ছিলেন।

১০৮ টি শিবমন্দিরের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু দেবালয়টি জনসাধারণের কাছে 'বুড়োশিব' -এর মন্দির নামে পরিচিত। এর আনুষ্ঠানিক নাম 'রাজরাজেশ্বর', দেওয়ালের প্রতিটি কোণে মিনারে ৮টি সরু থাম। উত্তরদিক ছাড়া তিন দিকেই প্রবেশদ্বার আছে। প্রবেশদ্বারে খিলান ও অবশিষ্ট দেওয়ালে এই আকৃতির ভরাট করা 'গথিক' রীতির স্মারক। দক্ষিণদিকের দেওয়ালের উঁচুতে নিবন্ধ শিলাফলকে উৎকীর্ণ লিপি। ১৭৫৪ খ্রিস্টাব্দে ইন্দ্রচুম্বী শিখরযুক্ত মন্দির নির্মাণ করে শিব বা শম্ভুকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৬ ফুট উঁচু, আটকোনা ভিত্তিবেদীর ওপর স্থাপিত। এই মন্দিরের ৮টি খাড়া দেওয়ালের প্রতিটির প্রস্থ ১৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। চূড়াসমেত সৌধটির উচ্চতা প্রায় ১২০ ফুট। বস্তুত: এত প্রাচীন ও উঁচু মন্দির পশ্চিমবঙ্গে আছে কিনা আমার জানা নেই।

কালোপাথরের শিবলিঙ্গটির উচ্চতা ৯ ফুট, বেড় ২১ ফুট ১০ ইঞ্চি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ কেন পূর্বভারতে এত বড় 'শিবলিঙ্গ' আছে কিনা সন্দেহ। হয়তো নেই। ত্রিজগতে গুণাধিক রামচন্দ্র কর্তৃক যেমন 'রামেশ্বর শিবলিঙ্গ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তেমনই কৃতী ব্রাহ্মণ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর রাজার সংজ্ঞা ধারণ করেন— 'ত্রিজগতী নাথ শিবাজী' ভক্তপরায়ণ 'শ্রীরাজরাজেশ্বর' নামে প্রতিষ্ঠিত হলেন। 'বুড়োশিব' বা রাজরাজেশ্বর' শিবমন্দিরের পূর্বদিকে অপেক্ষাকৃত ছোট চারচালা শিবমন্দির আছে। ৭ ১/২ ফুট উঁচু শিবলিঙ্গের নাম 'রাঞ্জীশ্বর'। শিবলিঙ্গের পাদপীঠেও বাংলায় সংস্কৃত ভাষায় লিপি উৎকীর্ণ আছে।

মহারাজ সমূহের মধ্যে রাজশ্রেষ্ঠ রূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করে অবস্থান করেছেন। 'হরি'র যেমন, লক্ষ্মী, তেমনি তার মহিষীও মহারাজ্ঞীরূপে মূর্তিমতী লক্ষ্মীর মতন। তিনি উৎকৃষ্ট হর্ম্যে প্রসন্নবদন শিবকে প্রতিষ্ঠিত করেন। আবার এই মন্দিরের কিছু দূরে ৮ ফুট উচ্চ ভিত্তি বেদীর ওপর রাম-সীতার পশ্চিমমুখী চারচালা মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। চালার প্রতিটি পিঠ ত্রিভূজাকার না হয়ে অনেকটা ঘন্টার লম্বদেশের মত। বিরল আকৃতির। দালানের ৫টি প্রবেশ খিলান ও গর্ভগৃহের ৩টি প্রবেশ খিলান 'গথিত'—স্থাপত্যানুগ। শিখরমুলের চারকোনে চারটি সরু আলংকারিক মিনার আছে। গর্ভগৃহে, কাঠের সিংহাসনে—কালোপাথরের উপবিষ্ট শ্রীরামচন্দ্র, পাশে দণ্ডায়মান সীতাদেবী ও লক্ষণ। এ-ছাড়া ৪ফুট উচ্চতায় 'শিবলিঙ্গ', 'রাধাকৃষ্ণ', 'কালী', 'গণেশমূর্তিও আছে। মন্দিরে-পশ্চিম দেওয়ালের নিবন্ধ শিলালিপি উৎকীর্ণ। নৃপতিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর প্রিয় মহিষীর সুন্দর সৌধে জানকী ও লক্ষণের সঙ্গে ত্রিভুবনপতি রামচন্দ্রকে আবির্ভূত করেছিলেন। সম্ভবতঃ পাথরের অপরূপ শিলামূর্তিটি মহারাজাই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তখনকার সময়ে 'ভৈম একাদশী' বা 'ভীম একাদশী' তিথিতে এই মন্দির প্রাঙ্গনে বিশাল জাঁকজমক করে প্রতি বছর ১৫ দিন ধরে মেলা বসে। হাজার হাজার দর্শনার্থী ও শিবভক্তি পরায়ণ মানুষের সমাগম হল। প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ মেলাটির 'ট্রাডিশন' আজও চলেছে। কিন্তু অত জাঁকজমক করে হয় না। শিবনিবাসের নিকটবর্তী, দূরদূরান্ত থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা সপরিবারের আসেন। প্রত্যন্ত গ্রাম ও শহর থেকে আজও আসেন। আনুমানিক ৩০০ বছর পূর্বের মেলায় আভিজাত্য আজ আর ততটা নেই। আমরা ছোটবেলা থেকে অভিভাবকের সঙ্গে মেলায় গিয়েছি। এখনও যাই। বিভিন্ন ধরনের দ্রব্য ও সামগ্রী নিয়ে মেলা বসে। মনোহারী জিনিস থেকে ভোগ্য সামগ্রী। তাছাড়া কাপড়, জামা, প্যান্ট, ঘড়ি, মাদুর, জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি। সবচেয়ে ভালোলাকে নলেনগুড়ের সন্দেশ, খাঁটি ছানার রসগোল্লা, পানতোয়া, গজা, গরম-গরম জিলিপি আর কত কি।

বর্তমানে-পুরোহিত স্বপন কুমার ভট্টাচার্য ও প্রশান্ত ভট্টাচার্য। পুরুষানুক্রমে তারা হলেন মন্দিরের দানভাজন। তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা হৃদ্যতা আছে। আরও তথ্য দিয়েছেন পরবর্তী সংখ্যায় লিখব আশা করছি।

নদীয়ারাজ শিবনিবাসে বিদ্যাচর্চার জন্য টোল স্থাপন করেন। বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভূমি দান করেন। কালের করাল গ্রাসে বর্তমানে একটিও টোল নেই। সেই পণ্ডিতমশাইও নেই, অনুগত ছাত্রও নেই। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, গবেষক ও অনুসন্ধানকারীরা ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করেও শিবনিবাসের মন্দির ও রাজপুরী নির্মাতা শিল্পীদের নাম, গোত্র ও আনুঙ্গিক বিষয় আজও অজানা। ১০৮ টি মন্দিরের মধ্যে মাত্র হাতে গোনা ৫টি মন্দির বর্তমান। মূলমন্দির ৩টির কিছুটা ব্যবধানে মহারাজের প্রাসাদের জঙ্গলাকীর্ণ ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। বর্তমানে অনেকাংশই মাটির নিচে প্রোথিত। জনশ্রুতি এই যে, রাজপ্রাসাদটি নাকি সুনিপুণভাবে সুরক্ষিত ও দুর্গের আকারে নির্মিত ছিল। অশ্বশালা, হস্তীশালা ও আনুষঙ্গিক রাজপ্রাসাদের চিহ্নাবশে, আজও বিদ্যমান।

শিবনিবাসের সুউচ্চ মন্দির ও রাজপুরীর বিশালতা ও অতুলনীয় স্থাপত্য সৌন্দযও মহারাজের রুচি, আভিজাত্য ও বৈভবের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। লোকশ্রুতি এই যে, রাজপুরীর পত্তন করে প্রথম রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেন। পরে ১৭৫৪-৬২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন। নদীয়ারাজ ছিলেন বিদ্যোৎসাহী ও সংস্কৃতি মনস্ক। তিনি বাংলার 'বিক্রমাদিত্য' নামেই খ্যাত। শিল্প-সাহিত্যানুরাগী, জ্ঞান-বিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী। শিবের - নিবাস মাহাত্মে কাশীধামতূল্য। তিনি শিবনিবাসে বৃহদাকৃত শিবলিঙ্গ ও মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা করে দ্বতীয় কাশী বাংলার কাশীধাম রূপে গরে তুলেছিলেন।

১৭৮২ খ্রিস্টাব্দে রাজত্বের পরে শিবনিবাসের রাজধানী পরিত্যক্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে 'বিজনভূমিতে' পরিণত হতে থাকে। একে একে নিভে যায় রাজপূরীর দৌউড়ির দেউটি। বিশাল সিংহদ্বার দিয়ে অন্তঃপুরচারিণীরা শিবিকারোহনে প্রবেশ করে না অন্তঃপুরে। অশ্বশালে হ্রেষার শব্দ আর নেই। শোনা যায় না, হস্তিসালে বৃংহন। শুধু নির্জনতা, জঙ্গলাকীর্ণ এই রাজপবী, প্রাসাদপুরী থেকে প্রহর শেষের ঘন্টাধ্বনি শোনা যায় না। মন্দির প্রাঙ্গনে নেই শঙ্খ-ঘন্টা-কাসরের আওয়াজ। খসে যাওয়া, নোনাধরা ইঁট ইতিহাস তার নীরব সাক্ষী। কিন্তু আশ্চর্যের কথা— বিশাল বিপুল প্রতিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কৃষ্ণচন্দ্র প্রবর্তিত মন্দির স্থাপত্যরীতি বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের নির্মাতারা এমনকি তার পরবর্তী বংশধরেরাও গ্রহণ করেন নি। এর প্রধান কারণ, অর্থাভাব, যুগ পরিবর্তন। কালের করালগ্রাস ও কারিগরি দক্ষতার হ্রাস।

সারাবছরে যে কোনো উৎসব অনুষ্ঠানে, মেলায় হাজার হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয়। এখানে শুধু ভক্তপ্রাণ মানুষ নয়, অসংখ্য সাধারণ মানুষ শিবনিবাসের বিরল রীতির সু-উচ্চ মন্দির তার বিশাল আকারের শিবলিঙ্গ দর্শন করার জন্য আসেন। গবেষক, প্রাবন্ধিক, বুদ্ধিজীবীরা নানা তথ্য জানার জন্য নানা প্রশ্ন করেন। বর্তমানের তত্ত্বাবধায়করা সেরকম কোনো তথ্য দিতে না পারায় বিফলমনোরথ হয়ে ফিরে যান।

একমাত্র চিরন্তন সাক্ষী— নূপুর-নিক্কণে চিরবহমান চূর্ণি। সৃষ্টির প্রথমলগ্ন থেকে বহতা চুর্ণি জানে শিবনিবাসের অতীত বৈভব। অস্তগামী সূর্যের মতই একদিন চূর্ণর বুকেই বিসর্জ্জিত হয়েছে শিবনিবাসের শিবলিঙ্গের গৌরব, গরিমা, খ্যাতি, যশ ও জৌলুষ। তবুও আমরা আশা ছাড়িনি। মানুষে সমবেত প্রচেষ্টায় অস্তগামী সূর্যে আবার নতুন সূর্যের উদয় হবে। আমরা সেই অপেক্ষায় আছি। যদিও এখনও দূরদূরান্ত থেকে শিব অনুরাগী ভক্তগণ আজও এসে শিবলিঙ্গের মস্তকে পূতবারি ঢালেন হৃদয়ের নিবিড় ভক্তি আর বিশ্বাসে। সেই ট্রাডিশন আজও চলছে।